প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় লিপি ও বাংলা লিপির উদ্ভব

সিন্ধুউপত্যকায় প্রাপ্ত সিন্ধুলিপি-ই ভারতের প্রাচীনতম লিপি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এ লিপির যথাযথ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। ফলে এই লিপি চিত্রলিপির পর্যায় অতিক্রম করে অক্ষরলিপিতে পৌঁছোতে পারেনি বলে অনেকেই মনে করেন। আবার কোনো কোনো লিপিবিজ্ঞানী, এই মাত্র কারণে লিপি বিবর্তনের ইতিহাস থেকে সিন্ধুলিপিকে সম্পূর্ণরূপে আলোচনার বাইরে রাখতে আগ্রহী। যদিও সিন্ধু সভ্যতা মিশর ও সুমের সভ্যতার সমসাময়িক এবং হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো থেকে পাওয়া সীলমোহর ও শিলালিপিতে খোদিত রয়েছে এ লিপির অজস্র নিদর্শন; গবেষণার ক্ষেত্রে যা যথেষ্টেরও বেশি। সুতরাং ক্যানিংহাম থেকে নির্মল কুমার বর্মা—এ লিপির পাঠোদ্ধারের বিশিষ্ট কাজটি এই মর্মে অসীম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি থেকে সিন্ধুলিপি পরীক্ষা করে দেখা গেছে — সুমেরিয়, প্রোটোইলামাইট, হিট্টাইট, মিশরিয়, ক্রিটিয় এবং চিনালিপির প্রাথমিক রূপের সঙ্গে এর সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো। এ থেকে লিপিপন্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ঐ সমস্ত লিপির অনুকরণে সিন্ধুঅঞ্চলের মানুষেরা সিন্ধুলিপি গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ভারতে যে ব্রাহ্মীলিপির ব্যাপক প্রসার ঘটে— তার সঙ্গেও সিন্ধুলিপির সাদৃশ্য অনেক। সম্ভবত এই কারণেই ড'সন বা ক্যানিংহামের মতো কেউ কেউ এরকমও মনে করেন যে, ভারতীয় পুরোহিতদের চেষ্টায় চিত্রলিপি থেকে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মীলিপির বিকশিত রূপটি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সিন্ধুলিপি যেহেতু ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠীলিপির চেয়ে প্রাচীন তাই ঐ লিপিগুলির ওপর সিন্ধুলিপির প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। এডওয়ার্ড টমাস, ব্রাহ্মীলিপির ওপর অতএব সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে প্রাক্ আর্য দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষেরা ব্রাহ্মীলিপি আবিষ্কার করেন। এর ওপর বিদেশী কোনা লিপির প্রভাব নেই, ব্রাহ্মীলিপি সম্পূর্ণত ভারতীয় লিপি। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লিপিবিশারদ হান্টারের অভিমতটিই সবচেয়ে প্রনিধানযোগ্য এবং একেবারে অন্যরকম। তাঁর মতে সিন্ধুলিপি থেকেই ফিনিসিয় এবং সাইপ্রাসের প্রাচীন অধিবাসীদের সাইপ্রিয়োটিয় বর্ণমালার উদ্ভব।

তবে, সিন্ধুলিপি বিষয়ে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য কাজটি যিনি করেছেন, তিনি নির্মলকুমার বর্মা। ১৯৯২ সালের দিল্লির বার্ষিক ইতিহাস কংগ্রেসে তিনি মহেঞ্জোদাড়োর ছ'শোটি শিলালিপি অবলীলায় পড়ে দিয়েছেন। সিন্ধুলিপি যে আদতে এ দেশীয়

Scanned with CamScanner

অস্ট্রিকগোষ্ঠীর একটি শাখা — সাঁওতালদের লিপি, দীর্ঘ বারো বছরের ক্ষেত্রসমীক্ষা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে তিনি তা প্রমাণ করেছেন। সাঁওতালরা যদিও এই লিপিচিহ্নগুলি তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ 'পূজাখোন্ড' হিসাবে দেখেন, কিন্তু জন মার্শালের গ্রন্থে মুদ্রিত লিপিগুলির সঙ্গে এর হুবহু মিল — নির্মলকুমারকে এ বিষয়ে উৎসাহী করে তোলে। এই ভাবে তিনি অন্তত বাহান্ন জন ধর্মগুরুর সাহায্যে কমবেশি বারোশোটি প্রতীক চিহ্নের সন্ধান পান। কিন্তু সিন্ধুলিপিতে ব্যবহৃত বর্ণের সংখ্যা ন'শোর কিছু কম। আসলে, সিন্ধুলিপিতে একটি ধ্বনিদ্যোতকের জন্য একাধিক চিহ্ন ব্যবহার করা হত। এক 'ন' ধ্বনির দ্যোতক হিসাবে এ রকম বাইশটি চিহ্ন পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মী বর্ণমালার মতো সিন্ধুলিপিগুলি ক্রম বিন্যস্ত ছিল কিনা তা জানার উপায় নেই। কিন্তু এগুলির আধুনিক ক্রমবিন্যাস একেবারে অসম্ভব নয়। নির্মল বর্মার সাজানো সিন্ধু বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণগুলি প্রথমে এবং পরে স্বরবর্ণগুলি রয়েছে। ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা একচল্লিশ এবং স্বরবর্ণের সংখ্যা বারো। সরাসরি এই বর্ণগুলির সঙ্গে বাংলা বর্ণের লিপি সাদৃশ্য না থাকলেও এ লিপি যে ভারতীয়লিপি, ব্রাহ্মীলিপির কয়েক স্তর আগের লিপি তা বোঝাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। রোমান বর্ণমালার ছাব্বিশটি বর্ণ এবং সংখ্যাচিহ্নের সঙ্গেও রয়েছে এর অবিকল সাযুজ্য। এবংবিধ কারণে সিন্ধুলিপি ও সংখ্যাচিহ্ন থেকেই রোমানলিপি ও সংখ্যাচিহ্নগুলি উদ্ভূত হয়েছে কিনা, অথবা ব্যুলার প্রমুখের অভিমত অনুযায়ী ফিনিসিয় প্রভৃতি ভারতীয় লিপি থেকে ব্রাহ্মীলিপির জন্ম কিনা — এ রকম বহু প্রশ্ন উঠে আসে।

চিত্র ১৫ : সিন্ধুলিপি

নির্মল কুমার বর্মার সিন্ধুলিপির পাঠ যে যথার্থ তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায় — সীলমোহরগুলির অঙ্কিত বিভিন্ন ছবিতে। মার্শালের গ্রন্থে উল্লেখিত ৮৭ সংখ্যার প্লেটের ২২২ সংখ্যক সীলমোহরের উদ্ধার করা পাঠ হল 'হ ঐ ই ইস (= হৈই ইস), অর্থ — ইনি দেবতা। উৎকীর্ণ লিপির তলায় যোগাসনে উপবিষ্ট শিবের প্রতিকৃতি। ইনি যদি শিব নাও হন, ধ্যানমগ্ন মূর্তিটি যে একজন দেবতা বা দেবকল্প ঋষির, তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। এ ছাড়াও সিন্ধুলিপির কিছু প্রতীক তথা সাঁওতালী 'পূজাখোন্ড' আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের সাঁওতালী নামের আদ্যক্ষরের সঙ্গে

Scanned with CamScanner

Indus Diagram o	Tribal Name of Diagram	First letter of the Tribal Name	Nearest Sound Value		
			NAGRI	ROMAN	Mackay Plate No. Sl. No
	KARMU	KA	क	KA	LXXXIV / 64
	Gogo Sowa Ram	GA	ग	GA	XCIII / 5
	D A N D DHAKI	DA	ड	ḌA	LXXXV / 120
	HO' ROK BANK	HA	ह	HA	XCIII / 9
			Nagri	Roman	Mackay
	B H A G E C H A N T FALA	BHA	भ	BHA	Plate No. Sl. No. XCIII / 1
	S A G A Y TORE YAN ANECH	SA	स	SA	LXXXIII / 23
	O H A Y CHONDON TIKLI	O	ओ	O	XCIII / 3
	L A U R I A THENGA	LA	ल	LA	XCIII / 5

চিত্র ১৬ : সাঁওতাল পূজাখোণ্ড তথা সিন্ধুলিপি প্রতীকের সাঁওতালী নাম, তার দ্যোতিত ধ্বনি

বাংলা বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনির অবিকল মিল লক্ষণীয়। যেমন — সাঁওতালী 'পূজাখোন্ড' তথা সিন্ধুলিপির প্রতীক '⋈' (ডম্বরু) চিহ্নটির সাঁওতালী নাম 'ডন্ডঢাকি' — এর দ্যোতিত ধ্বনি 'ড'।

কিন্তু সিন্ধুলিপি বিষয়ক নির্মল কুমারের অভিমত এখনো পর্যন্ত সন্দেহাতীত ভাবে একমাত্র সত্য নয়। এর যথেষ্ট কারণও আছে। সিন্ধুলিপি যদি এ দেশীয় লিপিই হয় — তবে এই লিপিতে এত বেশি মধ্য প্রাচ্যের স্থান নামের উল্লেখ কেন? অথবা মধ্য প্রাচ্যেরই হিব্রুভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, সিন্ধুলেখমালায় যাদের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে; এ রকম একাধিক প্রসঙ্গ — নির্মল কুমারের আবিষ্কারকে কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ণ করে।

কিন্তু, যে বিষয়টি নিয়ে আজ আর কোনো বিতর্কই নেই, তা হল সিন্ধুলিপিতে একাধিক লিখনরীতি প্রচলিত ছিল। অধিকাংশই ব্রাহ্মীলিপির মতো বাম থেকে ডাইনে লিখিত হলেও খরোষ্ঠীলিপির মতো ডান থেকে বামে, উপর থেকে নীচে এবং নীচে থেকে উপরে লিখিত নির্দশনও আছে। — এই তথ্য থেকে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠীলিপির লিখন রীতি যে সিন্ধুলিপিকে কোনো ভাবে অনুসরণ করেছে — তার একটি যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। (তথ্যসূত্র : *সিন্ধুলিপি : পাঠোদ্ধার ও ফলশ্রুতি*, বিনয়কুমার মাহাতা, *এবং এই সময়*, শারদ সংখ্যা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা নং ৮১-১৩০)

সিন্ধুলিপিকে বাদ দিলে ভারতের আদিলিপি নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী। বহু বছর আগে থেকেই এই দুই লিপিতে লেখা অজস্র নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে— এ দেশের প্রাচীন মুদ্রায়, ধাতু নির্মিত পাত্রে, পাহাড়ে, পাথরের ফলকে এবং স্তম্ভের গায়ে। কিন্তু পৃথিবীর অন্য অনেক প্রাচীন লিপির মতোই অনেক কাল অবধি এদের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। এই কাজটি প্রথম সার্থকভাবে সম্পাদন করেন — জেমস্ প্রিন্সেপ (১৭৯৯-১৮৪০)। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে টাঁকশালে চাকরি নিয়ে তিনি

কলকাতায় আসেন। এরপর, প্রথমে এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও পরে তার সচিব নির্বাচিত হন। পুরাতত্ত্বে তাঁর অসীম আগ্রহ, এ দেশীয় প্রাচীন মুদ্রা, সীলমোহর এবং লিপির প্রতি তাঁকে উৎসাহী করে তোলে। এইভাবে তিনি ১৮৩৭-৩৮ সাল নাগাদ সাঁচী স্তূপে প্রাপ্ত অশোকের শিলালিপি থেকে ব্রাহ্মী ও পেশোয়ারের কাছে পাওয়া অশোকেরই অনুশাসন থেকে খরোষ্ঠী লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করেন।

ভারতীয়লিপি ধারায়, প্রাচীনত্বের বিচারে ব্রাহ্মী ছাড়া অন্য যে লিপির কথা বলা হয়ে থাকে, সেটি হল খরোষ্ঠীলিপি। যীশুখ্রিষ্টের জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে এ লিপির উদ্ভব। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে, বিশেষত পাঞ্জাবে ও গান্ধারে এই লিপি অন্তত দেড় হাজার বছর প্রচলিত ছিল। এরপর তা সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। দু'হাজার বছরের বেশি পুরোনো কিছু মুদ্রায় এবং অশোকের শাহবাজগড়ী ও মনসেহ্‌রা প্রস্তর অনুশাসন দুটিতে খরোষ্ঠীলিপির নমুনা পাওয়া গেছে। এছাড়াও লিপিপন্ডিতেরা এমন কিছু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সন্ধান পেয়েছেন, যেগুলি এই লিপিতেই লেখা।

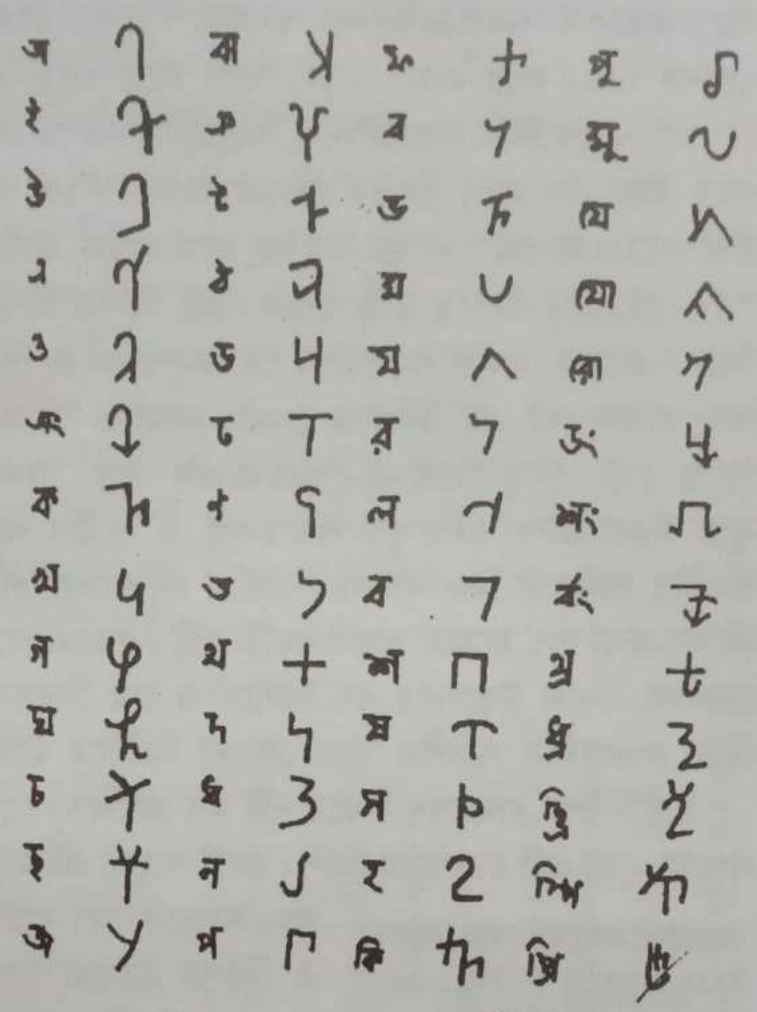

চিত্র ১৭ : অশোকের খরোষ্ঠীলিপি

ব্রাহ্মীলিপির মতো কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর লিখন রীতি বাম থেকে ডান দিকে হলেও অধিকাংশ জায়গায় তা ব্রাহ্মীলিপি লিখন্ পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ খরোষ্ঠীলিপি মূলত ডান থেকে বাঁ দিকে লেখা হত। এই লিপি ভারত ছাড়াও পূর্ব তুর্কিস্থান, নিয়া, লৌ-লান প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ছিল।

খরোষ্ঠী শব্দটি ইরাণী 'খরপোস্ত' শব্দ থেকে এসেছে। 'খর' অর্থ গাধা এবং 'পোস্ত' অর্থ চামড়া। অর্থাৎ বুৎপত্তিগত ভাবে খরোষ্ঠী শব্দের অর্থ — গাধার চামড়া। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে খরোষ্ঠীলিপির যে প্রাচীন নিদর্শনগুলি পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই উট, ঘোড়া বা গাধার চামড়ায় উৎকীর্ণ। খরোষ্ঠী নামকরণের পিছনে অতএব এই তথ্যটিই সবচেয়ে সংগতিপূর্ণ।

লিপিবিজ্ঞানীদের মতে সেমিয়লিপির উপধারা আরামিয়লিপির আদলে এই লিপি

Scanned with CamScanner

গড়ে উঠেছিল। আরামিয় বর্ণমালার বাইশটি বর্ণের সঙ্গে আরো তেরোটি স্বরবর্ণ ও মূর্ধন্য বর্ণের সংযোগে পরবর্তীকালে এ লিপির মোট বর্ণ সংখ্যা দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশ। ইরাণের সম্রাট দারিউস খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পাঞ্জাব ও সিন্ধু জয় করেন। এ কারণে ভারতের সংগে ইরাণের সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘটে। এছাড়াও আরামিয় ব্যবসায়ীরা এ দেশে যে ব্যবসা করতে আসতেন তার ফলে সে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ট হয়। অতঃপর আরামিয়লিপির অনুকরণে এবং তৎকালীন পণ্ডিতদের চেষ্টায় এ দেশের মতো করে একটি নতুন লিপি গড়ে ওঠে— খরোষ্ঠী হল সেই লিপি।

প্রাচীনত্বের নিরিখে ব্রাহ্মীলিপি, খরোষ্ঠীলিপির চেয়ে কিছুটা অর্বাচীন হলেও এরও বয়স কিছু কম নয়। খ্রিষ্টের জন্মের অন্তত ন'শো বছর আগে এ লিপির জন্ম। বিশ্বকোষের সংকলক নগেন্দ্র নাথ বসু মনে করেন, ভারতে প্রচলিত প্রধান বিয়াল্লিশটি বর্ণমালাই গড়ে উঠেছে ব্রাহ্মী থেকে। এই লিপির লিখন রীতি — বাম থেকে ডান দিকে। এখনো পর্যন্ত অশোকের যে অনুশাসন ও শিলালিপিগুলি পাওয়া গিয়েছে তার অধিকাংশই এই লিপিতে লেখা। সংস্কৃতে কোথাও অথচ ব্রাহ্মীলিপির উল্লেখ পর্যন্ত নেই। কিন্তু জৈনদের 'পঞ্চঞ্চাবান' সুত্ত, 'সমবারাঙ্গ' সুত্ত এবং 'ভগবতী' সুত্ত নামক গ্রন্থে এমন দুটি শব্দ (বম্ভী ও বংভী) পাওয়া গেছে যার সঙ্গে ব্রাহ্মী শব্দটির ধ্বনিগত মিল বর্তমান। এছাড়া বৌদ্ধদের 'ললিত বিস্তর'-এও যে চৌষট্টি লিপির কথা বলা হয়েছে তার প্রথমটি ব্রাহ্মী (এখানে খরোষ্ঠীলিপিরও উল্লেখ আছে)। প্রসঙ্গত, লিপি উদ্ভাবনায় বর্ণ বিন্যাস ও ক্রম বিভাগের ক্ষেত্রে এরকম বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সমকালীন পৃথিবীর আর কোনো লিপিতে লক্ষ্য করা যায়নি।

ব্রাহ্মীলিপির নামকরণ বিষয়ে দুটি মত প্রচলিত। (১) এ লিপি ব্রহ্মার কাছ থেকে পাওয়া। (২) এটি ব্রাহ্মণদের লিপি। বলাই বাহুল্য এই মত দুটি কোনোভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সংস্কৃতে তো বটেই, এমনকী বৈদিক সাহিত্যেও এ লিপির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

চিত্র ১৮ : বুদ্ধের অস্থি রাখা পাথরের পাত্র ও শিলালিখন, পিপরাওয়াখরোষ্ঠীলিপি

প্রাক্ অশোক যুগের বড়লী-র একটি স্তম্ভের গায়ে এবং নেপালের পিপ্‌রাওয়া স্তূপে প্রাপ্ত পাত্রলিপিতে ব্রাহ্মীলিপির যে যৎসামান্য নমুনা পাওয়া গেছে, তা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের। এর প্রথমটি জৈনগুরু ভগবান মহাবীরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁর মৃত্যুর (খ্রিস্টপূর্ব - ৫২৭অব্দ) ৮৪ বছর পরে লেখা — 'বীরায় ভগবতে / চতুরাসিতি বস।' এর লিপিকাল — ৫২৭+৮৪ খ্রিস্টপূর্ব, অর্থাৎ ৪৪৩ অব্দ। দ্বিতীয়টি ভগবান বুদ্ধের অস্থিপূর্ণ যে পাত্রলিপি তার লিপিকাল সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধ। কেন না, খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ অব্দে বুদ্ধদেবের মহাপ্রয়াণ ঘটে। এইমাত্র দুটিক্ষেত্র ছাড়া অশোক পূর্ববর্তী ব্রাহ্মীলিপির আর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। অবশ্য এই

Scanned with CamScanner

লিপিগুলির সঙ্গে অশোকের সময়কার ব্রাহ্মীলিপির তেমন কোনো বৈসাদৃশ্য নেই।

ব্রাহ্মীলিপির মতো এমন একটি সম্পূর্ণ লিপি, যেখানে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ধ্বনিগুলি মূল পাঁচটি বর্গে সুবিন্যস্ত এবং অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ, ঘোষ-অঘোষ ইত্যাদি সূক্ষ্মতর বিভাগে নিপুনভাবে সজ্জিত, তা যে একদিনে গড়ে ওঠেনি, তার পিছনে বহু শতাব্দীর সাধনা ও পরিশ্রম লুকিয়ে আছে, সে সম্পর্কে পন্ডিত নির্বিশেষে অবশ্যই একমত। কিন্তু এ লিপির আদি রূপ, তার বিবর্তন ও ইতিহাস বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

যাঁরা মনে করেন বিদেশী উৎস থেকে ব্রাহ্মীলিপির জন্ম, তাঁদের অধিকাংশেরই মত এই উৎসটি হল 'সেমিয় ও হামিয়' ভাষা বংশের সেমিয়লিপি। সেমিয় শাখার দুটি উপশাখা। একটি পূর্বী। অপরটি পশ্চিমা। পূর্বী উপশাখা থেকে এসেছে অসিরিয় (Assyrian), অক্কাদিয় (Akkadian), এবং ব্যাবিলনিয় (Babylonian) ভাষা। অন্যদিকে পশ্চিমা উপশাখারও দুটি ভাগ — দক্ষিণা ও উত্তরা। উত্তরাভাগ থেকে কানানিয় (Canaanite), ফিনিসিয় (Phoenician) ও আরামিয় (Aramic) ভাষার উদ্ভব। এর মধ্যে ফিনিসিয় ও আরামিয় ভাষাভাষীরা মিশরিয়দের কাছ থেকে লিপিবিদ্যা গ্রহণ করেন এবং ফিনিসিয় ও আরামিয় বর্ণমালা গড়ে তোলেন। ব্রাহ্মীলিপির বিদেশী উৎস বিষয়ে এই দুটি লিপিকেই লিপিবিশারদরা সবচেয়ে বেশি গুরত্ব দিয়ে থাকেন। যদিও সেমিয়লিপির ঠিক কোন্ ধারা বা উপধারা থেকে ব্রাহ্মীলিপির জন্ম তা নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে।

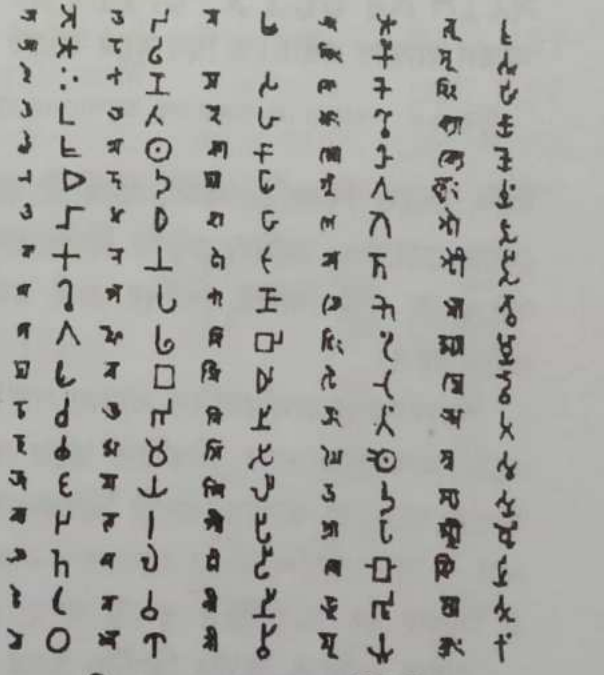

চিত্র ১৯: অশোকের ব্রাহ্মীলিপি

বেনফি, ওয়েবার, ইয়েনসেন, ব্যুলার, উইলিয়াম জোন্স প্রমুখ পন্ডিত ফিনিসিয় বর্ণমালা থেকে ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি বলে মনে করেন। কেন না, ফিনিসিয়লিপির সঙ্গে ব্রাহ্মীলিপির এক তৃতীয়াংশ বর্ণের যে যথেষ্ট মিল রয়েছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু ঘটনা হল, ব্রাহ্মীলিপির যখন জন্ম (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম -সপ্তম শতাব্দী) তখন ফিনিসিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্টতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেক পরে, আলেকজান্ডারের সময়ে (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭-২৮ অব্দ) এ দেশের সঙ্গে গ্রীকদের, যাঁরা ফিনিসিয়লিপি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তাছাড়া ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে ফিনিসিয়লিপিরই যে একমাত্র সাদৃশ্য রয়েছে তাও নয়। সাদৃশ্য রয়েছে আরামিয়লিপিরও। ফলে ডেভিড ডিরিঞ্জারের মতো আধুনিক লিপিবিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মীলিপির ওপর আরামিয়লিপির প্রভাবকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই দুই দেশের সঙ্গে বহু দিনের যোগাযোগও তাঁর অভিমতকেই পুষ্ট

Scanned with CamScanner

করে। ব্রাহ্মীলিপির উৎস বিষয়ে তাঁর *The Alphabate* (Vol. T. London, Hutchison and Company (Publication) Ltd. 1968, P.P. 17-18) গ্রন্থে যে বক্তব্য লিপিবদ্ধ রয়েছে, এ প্রসঙ্গে তা উল্লেখযোগ্য :—

> "It seems that great invention was due to the Sumerians, a people who spoke not a Semetic or Indo-European, but an agglutinating language ... some scholars, however, are begining to doubt whather we are right in crediting the Summerians with this achivement ... what ever the truth the earliest exam written cuneiform documents, are ... probably in the Sumerian language."

(উদ্ধৃতি : *সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা* ; ড. রামেশ্বর শ' পৃ. নং - ৪৭৬, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা) অন্যদিকে ক্যানিংহাম মনে করেন ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে মিশরিয়লিপির সাদৃশ্যই সবচেয়ে বেশি। এ. সি. মুরহাউস আবার ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠীলিপির ওপর সেমিয়লিপির প্রভাবের প্রবক্তা। কিন্তু সেমিয়লিপির কোন্ ধারা থেকে ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি তিনি তার উল্লেখ করেননি।

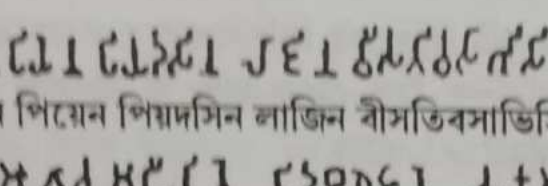
দেবান পিয়েন পিয়দসিন লাজিন বীসতিবসাভিসিতেন
অতন আগাচ মহীয়তে হিদ বুধে জাতে সক্যমুণীতি

চিত্র ২০ : বাংলা লিপ্যন্তর সহ অশোকের ব্রাহ্মীলিপি

যা হোক, ব্রাহ্মীলিপির প্রসারের ফলে খ্রিস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে এর তিনটি আঞ্চলিক রূপ গড়ে ওঠে। এগুলি — উত্তর ভারতীয়, দক্ষিণ ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয়। বহির্ভারতীয় লিপি থেকে তিব্বতি, বার্মী, যবদ্বীপী প্রভৃতি লিপির জন্ম। দক্ষিণ ভারতীয় লিপি থেকে তেলেগু, তামিল প্রভৃতি লিপি এবং উত্তর ভারতীয় লিপি থেকে সমান্তরাল ভাবে যে দুটি বিশিষ্ট লিপির জন্ম হল — তার একটি নাগরী এবং অন্যটি বাংলালিপি।

অনেককাল অপরিবর্তিত থাকার পর উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপি কুষাণ ও গুপ্তযুগে এসে আকারগতভাবে বিবর্তিত হতে শুরু করে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী নাগাদ অঞ্চলভেদে তা আবার তিনটি ভিন্নধারায় বিকশিত হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে এর নাম — সারদালিপি, উত্তর ভারতে — নাগরলিপি এবং উত্তর ভারতেই পূর্ব সীমান্তে এ লিপির যে পরিবর্তিত রূপটি গড়ে ওঠে তার নাম হয় — কুটিললিপি।

কুষাণ আমলে, অর্থাৎ খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতকে ব্রাহ্মীলিপির যে রূপটি প্রচলিত ছিল, তা কুষাণলিপি। প্রসঙ্গত, কুষাণলিপিতে এসেই অশোকলিপির — ক-চ-ঝ-ভ-দ-ন-প-য-ষ প্রভৃতি বর্ণের মাথায় সর্বপ্রথম সংক্ষিপ্ত 'মাত্রা'র প্রয়োগ শুরু হয়। যদিও ছ-জ-থ-ধ-ট-ঠ প্রভৃতি বর্ণগুলি অপরিবর্তিত থাকে; কিন্তু কুষাণলিপির 'চ' ও 'ট'-এর সঙ্গে প্রাচীন বাংলালিপির চ ও ট-এর আকৃতিগত আশ্চর্য মিল পরিলক্ষিত হয়।

Scanned with CamScanner

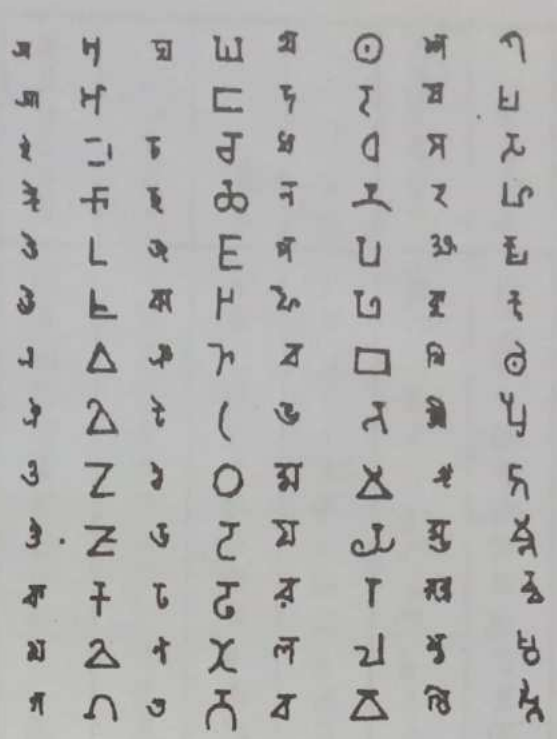

চিত্র ২১ : গুপ্তলিপি

উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপির পূর্ণ বিকশিত রূপটি গড়ে ওঠে খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে, গুপ্ত আমলে। এ লিপির নাম অতএব গুপ্তলিপি। গুপ্তলিপিতে স্বাভাবিক ভাবে কুষাণলিপির কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও — এই লিপিতে প্রায় সমস্ত বর্ণের মাথাতেই সংক্ষিপ্ত 'মাত্রা'-র প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। অঞ্চলভিত্তিতে এ লিপিরও দুটি ভাগ। পূর্বী ও পশ্চিমা। পূর্বী ভাগকে আবার দুটি উপভাগে বিভক্ত হতে দেখা যায়। এগুলিও — পূর্বী আর পশ্চিমা। গুপ্তলিপির এই পূর্বীভাগের পশ্চিমা উপভাগ থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে সিদ্ধমাতৃকালিপির জন্ম। এই সিদ্ধমাতৃকার একটি জটিল রূপ — কুটিললিপি। ড. সুকুমার সেন মনে করেন — "এই কুটিললিপি হইতে বাঙ্গালালিপির উদ্ভব।" (*ভাষার ইতিবৃত্ত*, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা নং ২৭)

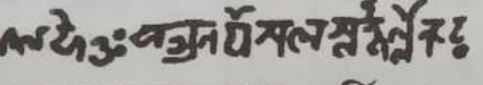

চিত্র ২২ : বাংলা লিপ্যন্তর সহ কুটিললিপি (ষষ্ঠ শতাব্দী)

কুটিললিপি সেই অর্থে কোনো রাজার শাসন কালের সঙ্গে জড়িত নয়। এটি গুপ্ত-পরবর্তী লিপি। এ লিপির আকার যেহেতু অত্যন্ত জটিল ও কুটিল — তাই এরকম নাম। নাগরী বা দেবনাগরীর মতো ভারতে বহুল প্রচলিত লিপিও — এই কুটিললিপি থেকে উদ্ভূত। খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এ লিপি পূর্ণ বিকশিত আধুনিক রূপ লাভ করে। এখনকার সংস্কৃত-হিন্দী-নেপালী-মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় এই লিপির ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

বাংলালিপির উৎস সম্পর্কে অবশ্য দুটি অভিমত প্রচলিত। কেউ কেউ মনে করেন — নাগরীলিপির পূর্বভারতীয় রূপটি থেকে একাদশ শতকে প্রত্ন বাংলালিপির জন্ম। অন্য অনেকের মতে— সিদ্ধমাতৃকালিপির পূর্বীভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে দশম শতাব্দীতে বাংলালিপি উদ্ভূত হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে — সিদ্ধমাতৃকার

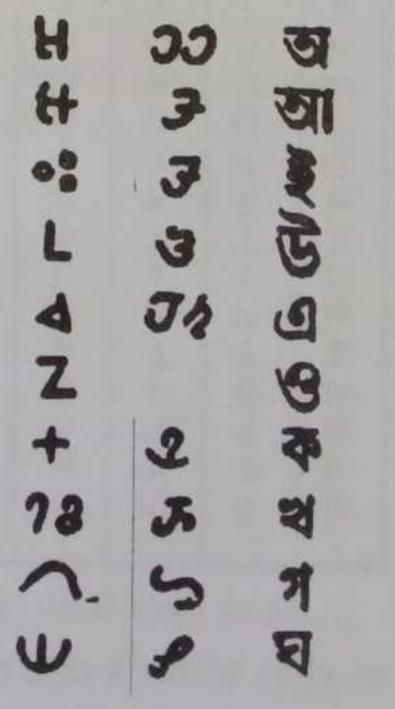

চিত্র ২৩ : ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী ও বাংলালিপি

Scanned with CamScanner

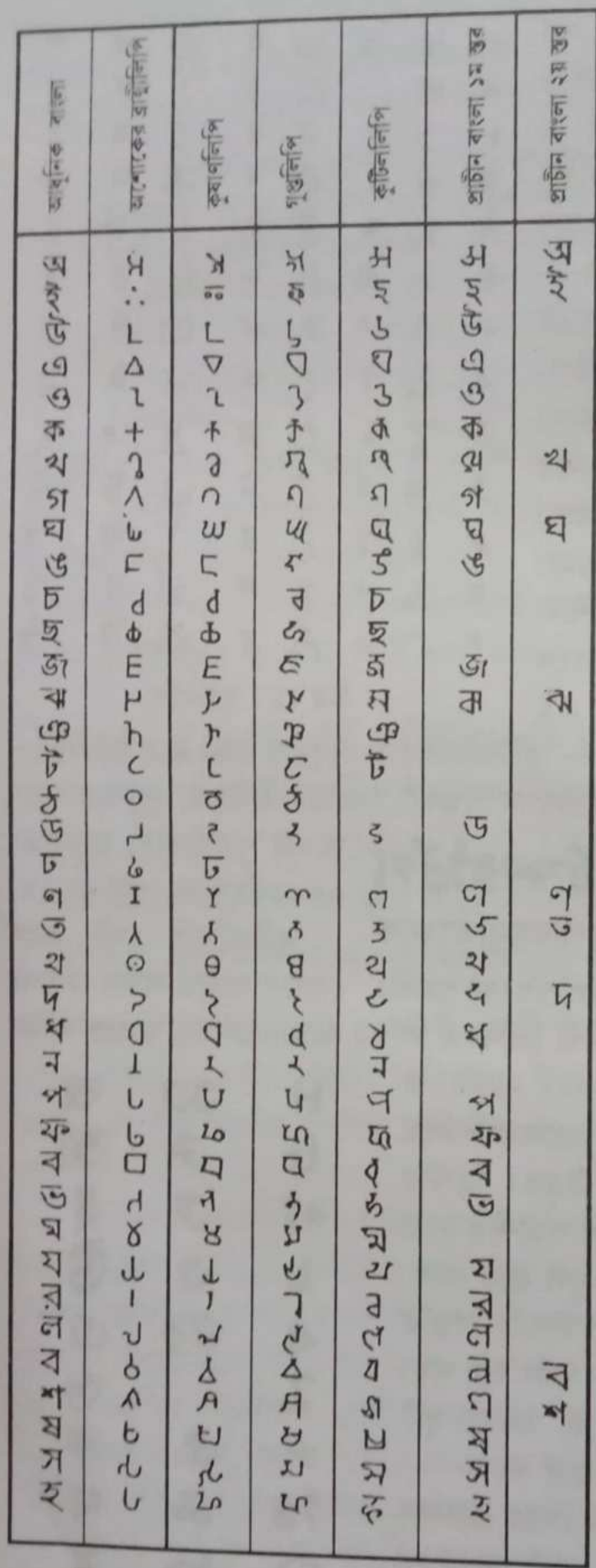

চিত্র ২৪ : লিপি বিবর্তন : ব্রাহ্মী থেকে বাংলা

কুটিললিপি থেকে সমান্তরাল ভাবে নাগরী ও বাংলালিপি বিকাশ লাভ করেছিল। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন —

"ব্রাহ্মী অক্ষর .... খ্রিস্টীয় ৮ম-১০ম শতাব্দীর মধ্যে বাংলা অক্ষরের জন্মদান করিয়াছে। দেবনাগরী অক্ষর ব্রাহ্মীলিপির আর একটি রূপান্তর মাত্র। দেবনাগরী অক্ষর থেকে বাংলালিপির জন্ম হয় নাই। কারণ নাগরী অক্ষরের আদিম রূপ দক্ষিণ-পশ্চিমের নাগরী-লিপি উত্তর-ভারতে প্রভূত্ব স্থাপনের পূর্বেই বাংলালিপির প্রাথমিক নিদর্শন মিলিতেছে। ... দক্ষিণ-পশ্চিমের এই নাগরীলিপি উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য স্থাপন করে অনেক পরে — অন্ততঃ ১০ম শতাব্দীর পূর্বে নহে।" (*বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খন্ড, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা নং ১২১)

অতএব, ড. রামেশ্বর শ'-এর "নাগরীলিপির কিছু প্রভাব প্রত্ন বাংলা লিপির উপরে পড়েছিল" (*সাধারণ ভাষা-বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, ড. রামেশ্বর শ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা নং ৪৮২) অভিমতটি মেনে নেওয়া যায় না। বরং নাগরীলিপির ওপর বাংলালিপির প্রভাব থাকাই ঐতিহাসিক ভাবে সংগত।

Scanned with CamScanner